বাংলার গৌরব

আশা বুক এজেন্সী

এ. কলেজ রো • কলিকাতা - ৯

নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সমস্ত প্রাথমিক (২য় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী) কিন্ডার গার্টেন ও ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য বাংলা দ্রুত পঠন হিসাবে লিখিত

A Classic Rapid for Junior Classes.

বাংলার গৌরব

৪'৬
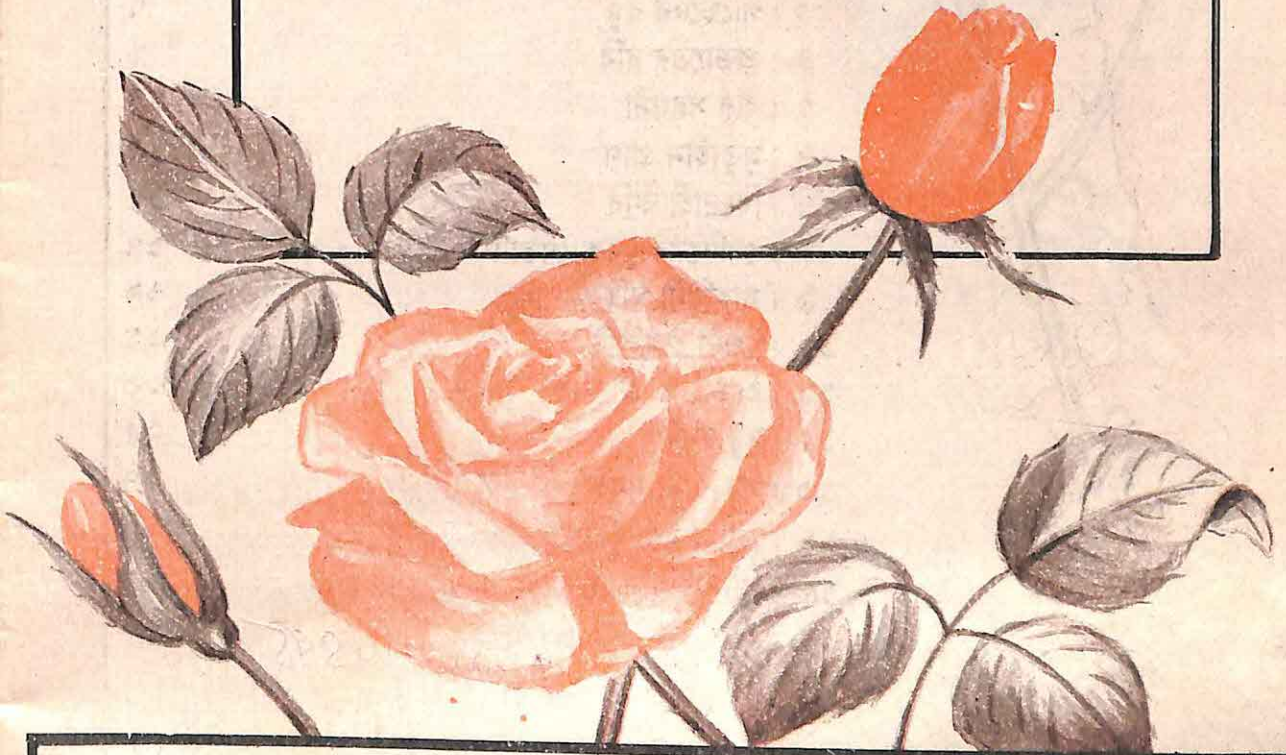
১০৫০

শ্রী সুনীল রায়

আশা বুক এজেন্সী

৮ এ. কলেজ রো • কলিকাতা - ৯

সূচীপত্র

পাগল পুরোহিত

পুরুত ঠাকুর গালে চড় মেরেছেন। তাও কিনা যাকে তাকে নয়, রাণী রাসমণিকে। রাণী রাসমণি, যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। বিরাট তাঁর সম্পত্তি। অগাধ তাঁর টাকা। তাঁর মন্দিরের সামান্য এক পুরোহিত, তিনি কিনা রাণী রাসমণির গালে চড় মারলেন !

ব্যাপারটা কি, তাহলে শোনো। মন্দিরের পুরোহিত পূজার যোগাড়ে ব্যস্ত। একটু পরেই পূজোয় বসবেন। রাণী রাসমণি হাজির হলেন মন্দিরে। তাঁর পুরোহিতকে সবাই বলে পাগল ঠাকুর। আপনভোলা মানুষ। রাসমনি এসেছেন মন্দিরে, পাগল ঠাকুরের পাগলামীটা কেমন, তা দেখতে। ঠিক এমন সময় ঘটে গেলো ব্যাপারটা। পাগল পুরোহিত রাণীমার কাছে এগিয়ে এসে তাঁর গালে কষিয়ে দিলেন এক চড়।

ধমক দিয়ে বললেন, 'ঠাকুরের সামনে এসেও সেই বিষয়-চিন্তা ? টাকা-পয়সার চিন্তা ?'

রাণীমা সামান্য পুরুত ঠাকুরের অপরাধ নিতে পারলেন না। কারণ সত্যিই যে তিনি মন্দিরে এসেও বিষয়-চিন্তা করছিলেন। আপন-ভোলা পাগলঠাকুর তাঁর মনের ফাঁকি ধরে ফেলেছেন। তাঁর বুঝতে বাকি থাকলো না, তাঁকে যারা পাগল বলে, তারা কত ভুল করে। আসলে তাঁর পুরুতঠাকুরটি মানুষ হলেও দেবতা।

এই পাগলঠাকুরই পরে বিখ্যাত হয়েছেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে। ইনি জন্মেছিলেন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে। ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এঁর জন্ম দিন। এঁর আগের নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। এঁর বাবার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। মা চন্দ্রমণি দেবী।

তোমরা বিবেকানন্দের নাম আশা করি শুনেছো। বিবেকানন্দের আগের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পাগলঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাতেই নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। সেও এক ঘটনা। বলি শোনো।

বিবেকানন্দ তখনও নরেন নামেই পরিচিত। তিনি ঈশ্বরকে খুঁজছিলেন। অনেক সাধু-সন্তকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা। কিন্তু কারও জবাবই তাঁকে খুশী করতে পারলো না। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে দেখা পেলেন রামকৃষ্ণের। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁরে নরেন, যেমন তোকে দেখছি, তেমনি করে আমি ভগবানকে দেখি।'

আহা, এমন জবাব নরেন কারও কাছে পান নি। সেদিন থেকেই নরেন রামকৃষ্ণের বশীভূত হলেন। রামকৃষ্ণের কৃপায় তিনিও জীবের মধ্যে শিব দর্শন করলেন। আমাদের হিন্দু ধর্মকে বিবেকানন্দ যে দুনিয়ার দরবারে পৌঁছে দিলেন, তাও এই পাগলঠাকুরের কৃপায়। রামকৃষ্ণের স্ত্রী মা সারদামণির নাম ও তোমরা শুনে থাকবে।

পাষাণেও যে প্রাণ আছে, তা ঠাকুর রামকৃষ্ণই দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রাণের ডাকে মা-কালী তাঁকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর হাত থেকে মা-কালী পূজোর নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন। আজ পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন নামে প্রতিষ্ঠান নাই। আজ সেদিনের সেই পাগল পুরোহিতের নাম সবার অন্তরে। আমরা তাঁকে পেয়ে ধন্য। ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন অমৃতলোকে।
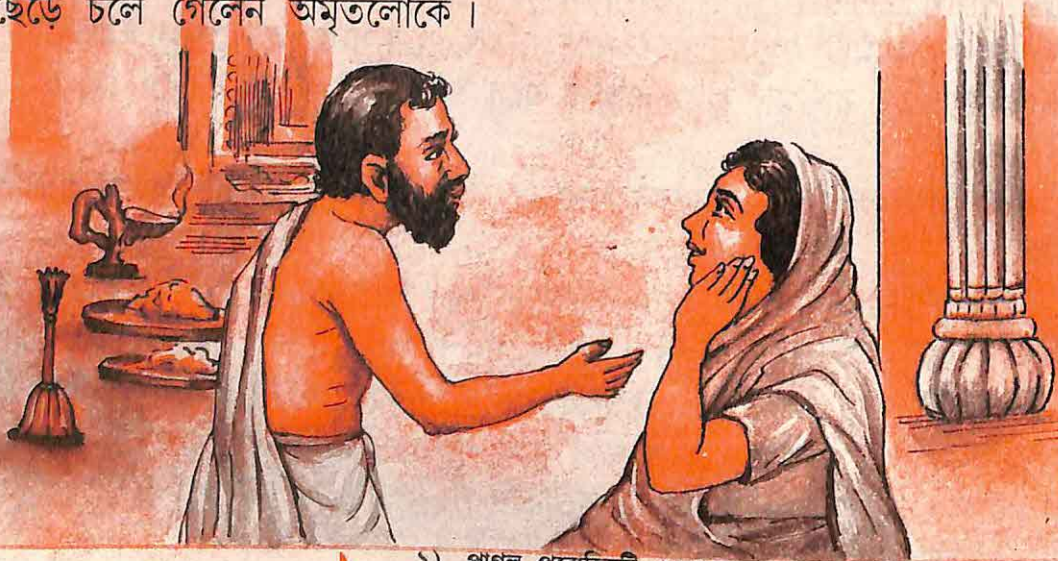
কিছু প্রশ্ন :

১) পাগল পুরোহিতটি কে ?
২) কে মন্দিরে এসে বিষয়-চিন্তা করছিলেন ?
৩) পাগল পুরোহিতের বাবার এবং মায়ের নাম কি ?
৪) তাঁর একজন বিখ্যাত শিষ্যের নাম লেখ।

মাতৃভক্ত ছেলেটি

বেঁটে-খাটো বাঙালী অধ্যাপকটি তাঁর উপরওয়ালা সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'সাহেব, আমাকে ছুটি দাও। মা ডেকেছেন।

সাহেব বললেন, 'যদি ছুটি না দিই'। জবাবে বাঙালী অধ্যাপক বললেন, 'ছুটি না দিলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো।' চাকরীর থেকে আমার কাছে আমার মায়ের ডাকের দাম অনেক বেশী'।

সাহেব ছুটি দিতে বাধ্য হলেন। অধ্যাপক বেরিয়ে পড়লেন তাঁর গ্রামের দিকে। পথে পড়ল নদী। দুরন্ত দামোদর। খেয়াঘাটের মাঝি বলল, 'না, নদীর, অবস্থা ভালো নয়। নৌকো ওপারে নিয়ে যেতে পারব না।' বাঙালী অধ্যাপকটি নদীকে ভয় পেলেন না। ওপারে এক গ্রাম থেকে তাঁর মা যে তাঁকে ডাকছেন। 'জয় মা' বলে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন নদীতে। সাঁতার দিয়ে পৌঁছে গেলেন পরপারে। গভীর রাতে কষ্টকে অগ্রাহ্য করে হাজির হলেন মায়ের পাশে।

এর পর তোমরা বোধহয় বুঝেই ফেলেছ, ইনিই বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এঁর বাবা। মা ভগবতী দেবী। বহু বিদ্যার তিনি অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। গ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়া তিনি অল্পদিনেই শেষ করে ফেলেছিলেন। তারপর বাবার সঙ্গে এসেছিলেন কলকাতায় আরও বেশী লেখাপড়া শেখবার জন্যে। তাঁর বাবা তখন কলকাতায় সামান্য মাইনের চাকরি করতেন।

তখনকার দিনে এখনকার মত গাড়ীঘোড়ার চল ছিল না। বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটেই কলকাতায় আসতে হয়েছিল। পথের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে পোঁতা ছিল মাইলস্টোন। সেগুলির গায়ে খোদাই করা ছিল ইংরেজী সংখ্যা। বালক ঈশ্বরচন্দ্র পথেই বাবার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ছিলেন ইংরেজীর এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি।

কলকাতায় পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্যে তিনি মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পেতেন। নিজে গরীবের ছেলে বলে গরীব সহপাঠীদের দুঃখ বুঝতেন। তিনি নিজের খরচ থেকে বাঁচিয়ে-রাখা পয়সা দিয়ে গরীব সহপাঠীদের সাহায্য করতেন। তাঁর মাথাটি ছিল দেহের তুলনায় আকারে বেশ বড়। সেই জন্যে তাঁকে মজা করে অনেকে বলতেন, 'যশুরে কৈ।' কেউ কেউ আবার আর মজা করে বলতেন, 'কেশুরে বৈ।'

তিনি কেবল বিদ্যাসাগরই ছিলেন না দয়ার সাগরও ছিলেন। দীন-দুঃখীদের বেদনায় তিনি কেঁদে ফেলতেন। সাধ্যমত সাহায্য করতেন তাঁদের। বাঙলার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সাধারণের লেখাপড়ার জন্যে তিনি বর্ণপরিচয় এবং অন্যান্য আরও অনেক বই লিখে গেছেন। মেয়েরাও যাতে পুরুষদের মত লেখাপড়া শিখে সমাজের কাজে আসে, সেকথা ভেবে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া চালু করেছিলেন। তিনি খুব সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতেন। যে কাজকে তিনি ভালো বলে মেনে করতেন, তা তিনি করতেনই। মনের জোরে যেকোন বিপদকেই যে জয় করা যায় সে শিক্ষা বিদ্যাসাগর আমাদের দিয়ে গেছেন। এই মহাপুরুষ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। বাঙালীদের মনে চিরকাল তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

কিছু প্রশ্ন :

১) বেঁটে-খাটো বাঙালী অধ্যাপকটির পুরো নাম কি ?
২) কোন্ জেলার, কোন গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন ?
৩) তিনি কি ভাবে ইংরাজী সংখ্যা শিখেছিলেন ?

গাছেদের বন্ধু

কয়েকজন শিকারীকে নিয়ে আর এক শিকারী গেছেন শিকার করতে। আসামের জংগলে। এগিয়ে চলেছেন শিকারীরা। সামনে বাঘ বা অন্য কোন বুনো জানোয়ার এলেই চালাবেন বন্দুক। হঠাৎ একজন শিকারী বনের মধ্যে শুনতে পেলেন খস্-খস্ আওয়াজ। হ্যাঁ, আওয়াজটা ক্রমশ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। অব্যর্থ নিশানায় শিকারী বন্দুক চালালেন। বন্ধ হলো শব্দ। শিকারী এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, না, কোন জন্তু নয়। তার গুলি গিয়ে বিঁধেছে একটা গাছের গুঁড়িতে। আর রক্তের মত বার হয়ে আসছে গাছের রস। শিকারী ব্যথা পেলেন। তাঁর মনে হলো, গাছটা যন্ত্রণায় কাঁদছে। তিনি ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন গাছের গায়ে গুলি বেঁধা জায়গাটায়।

পরবর্তী সময়ে ইনি সত্যিই বুঝেছিলেন গাছেদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা। হ্যাঁ, এই শিকারীর নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। যিনি সারা পৃথিবীর মানুষদের প্রথম শেখালেন, গাছেদেরও প্রাণ আছে।

ইউরোপের এক বিজ্ঞান-সভা। বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র গেছেন সেই সভায় গাছেদের যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করার জন্যে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। জগদীশচন্দ্র সুন্দরভাবে তাঁর যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখালেন, গাছেরাও আমাদের মত সুখ-দুঃখে সাড়া দেয়। ধন্য ধন্য করে উঠলো সারা বিশ্ব।

জগদীশচন্দ্র ঢাকা জেলার রাড়ীখাল গ্রামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি কালেকটর। কিন্তু

তিনি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন। জগদীশচন্দ্রকেও তিনি ছোটবেলায় একটি সাধারণ স্কুলেই পড়িয়েছিলেন। স্কুলে জগদীশচন্দ্রের পাশে বসতো তাঁর বাবার চাপরাশির ছেলে এবং একটি জেলেদের ছেলে।

ছোটবেলা থেকেই বালক জগদীশ অন্য ধরণের ছেলে ছিলেন। অন্য ছেলেরা যখন খেলার ছলে গাছ-পালার ডাল ভাঙতো, পাতা ছিঁড়তো, জগদীশচন্দ্র তা পারতেন না। তিনি ভাবতেন, ডাল ভাঙলে পাতা ছিঁড়লে গাছেরা কষ্ট পাবে। তাঁর এই অনুভব পরে তাঁর জীবনে কাজে লেগেছিল।

বিলাতে তাঁকে অনেক বেশী বেতন দিয়ে সেখানকার কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনি তাঁর দেশের কথা ভেবে সেই লোভ ত্যাগ করেছিলেন।

বেতারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সংবাদ পাঠানোর যে আবিষ্কার, তা তিনিই প্রথম করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে তা প্রচার না করায় বৈজ্ঞানিক মার্কনি এই আবিষ্কারের সুনাম পান।

বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে তিনি কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিককে গবেষণায় নানা ভাবে সাহায্য করে চলেছে। চালে-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং ব্যবহারে খুব অমায়িক ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। ১৯৩৭ সালে নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশের দেহাবসান হয়।

কিছু প্রশ্ন :

১) শিকারীর বন্দুকের গুলি শিকারের বদলে কিসে লাগলো ?
২) শিকারীর আসল পরিচয় কি ?
৩) জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার কি কি ?

প্রভাতের রবি

একদিন ভাগনা তার মামাকে বললো, 'কবিতা লিখবি ?'

মামা বললো, 'সে আবার কেমন করে লিখবো ?' ভাগ্না বসে গেল তার মামাকে কবিতা লেখা শেখাতে। মামা-ভাগ্নার বয়সের তফাৎ খুবই কম। ভাগ্না হলো মামার কবিতা লেখার গুরু।

মামা ছেলেটি তার পর থেকে শুরু করলো কবিতালেখা। খবরটা রটে যেতে দেরী হলো না। সাতকড়ি দত্ত নামে ছিলেন এক মাস্টারমশাই। তিনি একদিন মামা-ছেলেটিকে বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই নাকি কবিতা লিখিস ? আচ্ছা, আমি দু'লাইন লিখে দিচ্ছি। বাকি দু'লাইন লিখে মেলা দেখি !' তিনি লিখলেন, 'রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই, বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।' মামা-ছেলেটি লেখে, 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, এখন তাহারা সুখে জল-ক্রীড়া করে।'

শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত বললেন, 'হ্যাঁরে তোর হবে, হবে।'

সত্যিই হয়েছিল। শুধু হয়েছিল বললে কম বলা হবে। সেই ছেলেই একদিন কবিতায়-গানে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করলো। ঠিকই বুঝেছ। কবিতা লেখা ছেলেটিই আমাদের প্রিয়তম কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ভাগ্নাটি রবি ঠাকুরের ভাগ্না জ্যোতিঃপ্রকাশ।

দাদারা স্কুলে যায়। বালক রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে স্কুলে যাবার বায়না ধরে। সে তখন ছোট রবি। স্কুলে যাবার বয়স হয়নি। তবু তার বায়না থামানো যায় না। তা দেখে পড়াতে-আসা শিক্ষক বললেন, 'আজ স্কুলে যাবার জন্যে যেমন কাঁদছো, বড় হলে স্কুলে না যাবার জন্যে তেমনি কাঁদবে।'
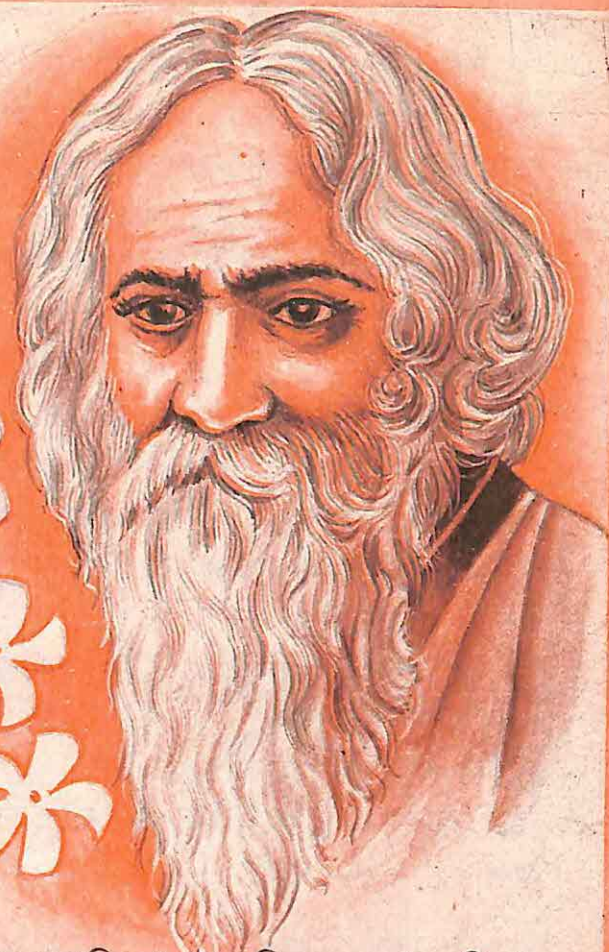
শিক্ষকমশায়ের সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সেই ছোট রবি হলো স্কুল—পালানো ছেলে। স্কুলের চারদেওয়ালের বাঁধন তার ভালো লাগতো না। তাই তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক রবির পড়াশোনার ব্যবস্থা বাড়িতেই করলেন। ছোট রবি পড়লো বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় থেকে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে বলেছেন, 'এই 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' আমার জীবনের প্রথম কবিতা।'

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। মা সারদা দেবী, রবির ছোট বেলাতেই মারা যান। মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথ চাকর-বাকরদের খবরদারীতেই বড় হতে লাগলো। ছোট রবি বড় দুরন্ত। সে কখন কোথায় আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। তাই চাকর শ্যাম তার কাজের চাপ কমানোর জন্যে রবিকে ঘরে আটকিয়ে দরজার কাছে খড়ির দাগ টেনে দিয়ে যেতো।

রবি রামায়ণ শুনেছে। জেনে ফেলেছে, লক্ষ্মণের গণ্ডী পার হয়ে সীতার কি মহাবিপদ হয়েছিল। সে চাকর শ্যামের গণ্ডী পার হতো না।

তখন রবি আর ছোট নন। বিশ্বজোড়া নাম কবি হিসেবে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে ইংরেজ নিরীহ ভারতবাসীদের গুলি করে মারলো। ইংরেজ সরকার তাঁকে 'নাইট্' উপাধি দিয়েছিল। ঘৃণায় সে উপাধি ত্যাগ করলেন তিনি।

তোমরা বোধহয় জানো, গীতাঞ্জলি রবি ঠাকুরের লেখা একটি গানের বই। তিনি ওই গীতাঞ্জলির জন্যে কবি হিসেবে সব সেরা সম্মান নোবেল্ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে তিনি গড়ে তুললেন বিরাট বিদ্যালয়। যা আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। আজ দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করতে আসেন।

আজ আমরা সারা দেশের সবাই জাতীয় সংগীত হিসাবে যে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গাই, তাও রবীন্দ্রনাথের রচনা। এই মহান কবি, বিশ্বকবি ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ চলে গেলেন অমরলোকে।

কিছু প্রশ্ন :

১) রবীন্দ্রনাথকে কে কবিতা লেখা শেখান ?
২) চাকর শ্যাম রবিকে ঘরে আটকাবার জন্যে কি করতো ?
৩) কোন বইটির জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ?

বীর সন্ন্যাসী

কলকাতায় চড়ক মেলা। একটি ছেলে তার বন্ধুকে নিয়ে গেছে মেলা দেখতে। না, মেলা থেকে সে কোন খেলনা কেনে নি। কিনেছে শিবঠাকুরের একটি মূর্তি। ছেলেটির ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর-দেবতায় দিকে খুব মন।

চড়কমেলা দেখে ফিরতে ফিরতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ছেলেটি মেলা দেখার আনন্দে টের পায়নি। তখনকার দিনের কলকাতায় এখনকার দিনের মত এত আলোর রোশনাই ছিল না। অন্ধকার পথ। ছেলেটির বন্ধু অন্ধকারে ঠিক দেখতে না পেয়ে কখন এক সময় ফুটপাথ ছেড়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে চলেছিল ঘোর বিপদ। পিছন থেকে ঘোড়ার গাড়ি এসে পড়েছে। বন্ধু ছেলেটি একেবারে ছুটন্ত ঘোড়ার নীচে পড়ে পড়ে অবস্থা। ছেলেটি তার বন্ধুটিকে বাঁচাবার জন্যে নিজেও লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। চারদিক থেকে 'গেলো গেলো' রব পড়ে গেলো। সাহসী ছেলেটি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুটিকে বার করে নিয়ে আসে এক ঝটকায়। বাড়ি ফিরে মা সেকথা শুনতে ছেলেটিকে আর্শীবাদ জানিয়ে বললেন,, 'এমনি করে যেন বিপদকে তুমি জয় করতে পারো।'

ছেলেটি পরে শুধু বিপদ জয় নয়, বিশ্বকে জয় করেছিলো।

লেখা পড়াতেও ছেলেটি ছিল সেরা। অল্প সময়ে সে পড়া আয়ত্ত করে নিতো। তবে তাকে নিয়ে গুরুমশায়ের ছিল বেশ ঝামেলা। শাসন করলে সে বেয়ারা হয়ে উঠতো। গায়ে হাতবুলোলেই জল.। ছোটবেলা থেকে সব কিছু যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইতো। কোন কিছু বললেই ছেলেটির বাঁধা প্রশ্ন, 'কেন ?' এই 'কেন'-এর জবাব দিতে তার গুরুমশাই হিমসিম খেয়ে যেতেন।
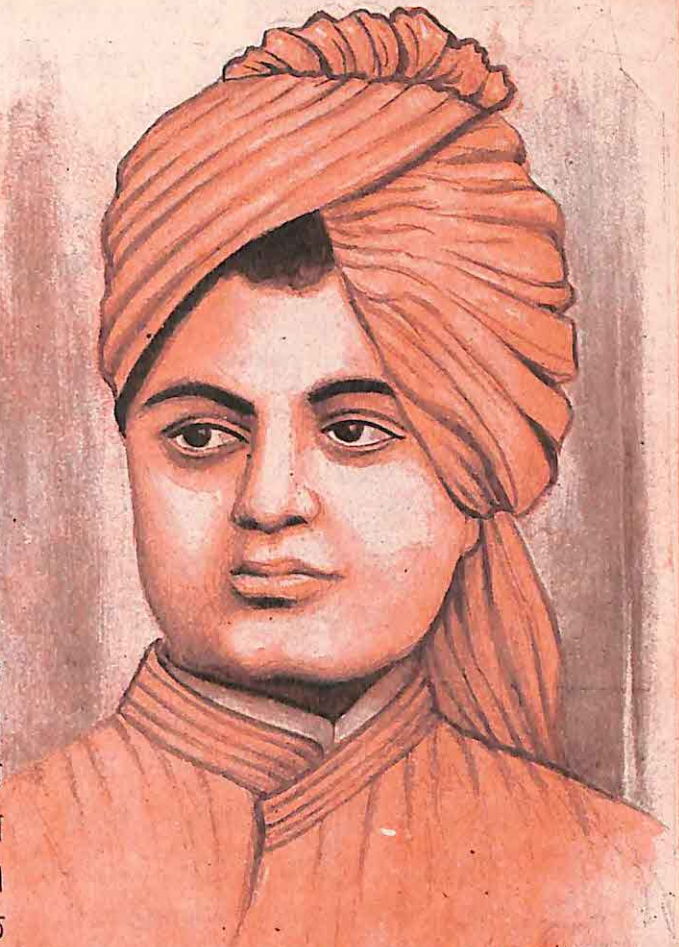
ছেলেটির বাবা ছিলেন উকিল। নানা জাতের লোক আসতেন তাঁর কাছে। তখনকার দিনে হুঁকোয় তামাক খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাই সবার জন্যে থাকতো আলাদা আলাদা হুঁকো। এক জাতের লোকের হুঁকোয় আর এক জাতের লোক টান দিলে তার জাত চলে যাওয়ার ভয় ছিল।

ছেলেটি ভাবতে থাকে, জাত কেমন করে যায়। তা পরখ করার, জন্যে সে করলো কি জানো ? একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে সব জাতের হুঁকোগুলো একের পর এক টেনে চললো ছেলেটি।

উকিল বাবা তো দেখতে পেয়ে বলেন, 'কি করছো ?' ছেলেটি জবাব দেয়, আমার জাত কেমন করে, কোথা দিয়ে যায়, তা পরীক্ষা করে দেখছি।'

এখন বলি, ছেলেটির নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যিনি পরে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে আমরা স্বামীজীও বলি। নরেন্দ্রের বাবার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত। মা-র নাম ভুবনেশ্বরী। ইনি ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী, পৌষ সংক্রান্তিরদিন কলকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইনি পরমভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নামে পৃথিবী বিখ্যাত হন।

আমেরিকার চিকাগো শহরে এক বিশ্বধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেই সভায় সন্ন্যাসী হিসাবে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করতে উঠে প্রথমেই বলেছিলেন, 'হে আমেরিকাবাসী ভাই-ভগ্নীরা...তাঁর বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে অনেকেই বিবেকানন্দের শিষ্য-শিষ্যা হন। এঁদেরই একজনের নাম ভগিনী নিবেদিতা। যিনি স্বামীজীর ডাকে ভারতের সেবা করতে এদেশে এসেছিলেন। পৃথিবীর দেশে দেশে রামকৃষ্ণ মিশন নামে সেবাপ্রতিষ্ঠান স্বামীজীই প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দ দেহ ত্যাগ করেন। তিনিই শিখিয়েছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

কিছু প্রশ্ন :

১) ছেলেটি কিভাবে তার বন্ধুকে বাঁচালো ?
২) সাহসী ছেলেটির আসল পরিচয় কি ?
৩) বিশ্বধর্মসভা কোথায় হয়েছিল ?
৪) বিবেকানন্দের পূর্বনাম কি ছিল ?

মৃত্যুহীন প্রাণ

এক ভদ্রলোক এলেন ব্যারিস্টার বাবুর বাড়িতে। তিনি বড় দাতা। মানুষের অভাবের কথা শুনলেই তিনি দান করেন। এ খবর ভদ্রলোক জানতেন। তিনিও বড় অভাবে পড়েছেন। তাই এসেছেন ব্যারিস্টারবাবুর বাড়িতে। সাহায্য চাইবেন। কিন্তু দারোয়ান তাঁকে ঢুকতে দিল না। কারণ ব্যারিস্টারবাবুর কোর্টে বার হবার সময় হয়ে গেছে।

এমন সময় ব্যারিস্টারবাবু বাইরে এসে গাড়িতে উঠলেন। ভদ্রলোকটিকে দেখেই তিনি বুঝেছেন, লোকটি অভাবী। তিনি তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলেন। ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন না, তিনি কার গাড়িতে উঠেছেন। কারণ তিনি ব্যারিস্টারবাবুর নাম শুনলেও চোখে দেখেন নি।

ব্যারিস্টার গাড়ির মধ্যেই শুনে নিলেন ভদ্রলোকের দুঃখের খবর। তারপর তিনি তাঁকে বাইরে বসিয়ে কোর্টের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন পাঁচশ টাকার একখানা চেক্। ভদ্রলোক অবাক। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হলো না, গাড়িতে দেবতার মত যে মানুষটির সঙ্গে তিনি এলেন, তিনিই ব্যারিস্টারবাবু। যিনি সারা দেশবাসীর কাছে দেশবন্ধু নামে পরিচিত। যাঁর পুরো নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

চিত্তরঞ্জনের আদিবাসভূমি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রামে। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় কলকাতা মহানগরীতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে। তাঁর বাবার নাম ভুবনমোহন দাশ।

সে সময় সারা দেশ জুড়ে চলছিল স্বদেশী আন্দোলন। কয়েকজন বাঙালী যুবক ইংরেজদের মারার জন্যে বোমা তৈরী শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ পুলিস সন্ধান করে তাঁদের ধরে ফেলে।

দেশের আর এক স্বাধীনতা পূজারী ঋষি অরবিন্দও বোমা তৈরীর অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন। আদালতে তাঁদের নামে মামলা উঠলো। চিত্তরঞ্জন এইসব দেশনেতাদের পক্ষে ওকালতি করলেন। আর বুদ্ধির জোরে অরবিন্দ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মামলায় জিতিয়ে দিলেন। এই মামলার পরে চিত্তরঞ্জনের নাম-যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি সে সময় ওকালতী করে এক একদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। তিনি সেই সমস্ত টাকা গরীব-দুঃখীদের দান এবং দেশের কাজে দু'হাতে খরচ করে দিতেন। বলা যেতে পারে, রাজার মত রোজগার করলেও দান করে ফকির হয়ে যেতেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে তিনি পুরোপুরি দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। দেশের ডাকে তিনি বেরিয়ে এলেন। আর তাঁর ডাকে বেরিয়ে এলেন দলে দলে বহু মানুষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকেই তাঁর গুরু বলে জানতেন এবং মানতেন।

তিনি দেশবাসীর জন্যে তাঁর কলকাতার বাড়িটি পর্যন্ত দান করেছিলেন। সেই বাড়িই এখন 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে পরিচিত। যিনি দেশবাসীর এমন আপনজন, তিনি সত্যিই দেশবন্ধু। এই মহান মানুষটি দেশবাসীকে কাঁদিয়ে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন বৈকালে দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরেও তিনি অমর। তাই কবি লিখেছেন,

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যু হীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

কিছু প্রশ্ন :

১) দারোয়ান ভদ্রলোকটিকে ঢুকতে দিল না কেন?
২) ব্যারিস্টার বাবুটির আসল পরিচয় কি?
৩) তাঁকে দেশবন্ধু বলা হতো কেন?

বিদ্রোহী কবি

বর্ধমান জেলার ছোট একটি গ্রাম। নাম চুরুলিয়া। এই গ্রামেরই একটি ছেলে দুষ্টুমীতে ওস্তাদ। শখ করে কেউ বাগানে ফুল ফুটিয়েছে। দুষ্টু ছেলেটি কোন্ ফাঁকে সে সব ফুল ছিঁড়ে তছ্‌নছ্ করে দেয়। কার গাছে কোন্ ফলটি পেকেছে, পাখিদের আগে টের পায় ছেলেটি। ব্যস, পরক্ষণেই সে ফল উধাও।

গাঁয়ের লোকেরা ছেলেটির বাবাকে বলে, 'ভর্তি করে দাও পাঠশালায়। গুরুমশায়ের ধমকানি আর কানমলা খেয়ে সোজা হয়ে যাবে। তবে তোমার ছেলে যা দুরন্ত, ওর পড়াশোনা হবে না।' কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিল দুষ্টু ছেলেটি। অল্পদিনেই লেখাপড়া সে বেশ আয়ত্ত করে নিলে। কিন্তু ওর কপাল ভালো নয়। বছর দুই বাদেই ওর বাবা মারা গেলেন।

বিধবা মা একা সংসার সামলাতে গিয়ে ছেলেটির লেখাপড়া হলো না। এরপর সে কিছুটা বড় হতে গ্রাম থেকে পালিয়ে এলো আসানসোল শহরে। চাকরি নিলো একটা রুটির দোকানে। সেখানে এক পুলিস সাহেবের নজরে পড়ে ছেলেটি। ছেলেটির চেহারাও যেমন সুন্দর, গানের গলাও তেমনি মধুর। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন নিজের দেশে, পূর্ববাংলার মৈমনসিংহে। সেখানে সে লেখাপড়া শিখলো। তারপর নিজের দেশে ফিরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে গেলো যুদ্ধে—হাবিলদার হয়ে। এমনই খামখেয়ালী সে।

কিন্তু এই যুদ্ধ থেকে ফিরে শুরু করলেন আর এক যুদ্ধ। তখন এদেশ পরাধীন। পরাধীন ভারতবাসীকে জাগাতে তিনি লিখলেন ঘুম-ভাঙানোর গান। লিখলেন অজস্র কবিতা। যা পড়ে দেশবাসীর মনে জাগলো দেশ সেবার সাড়া।
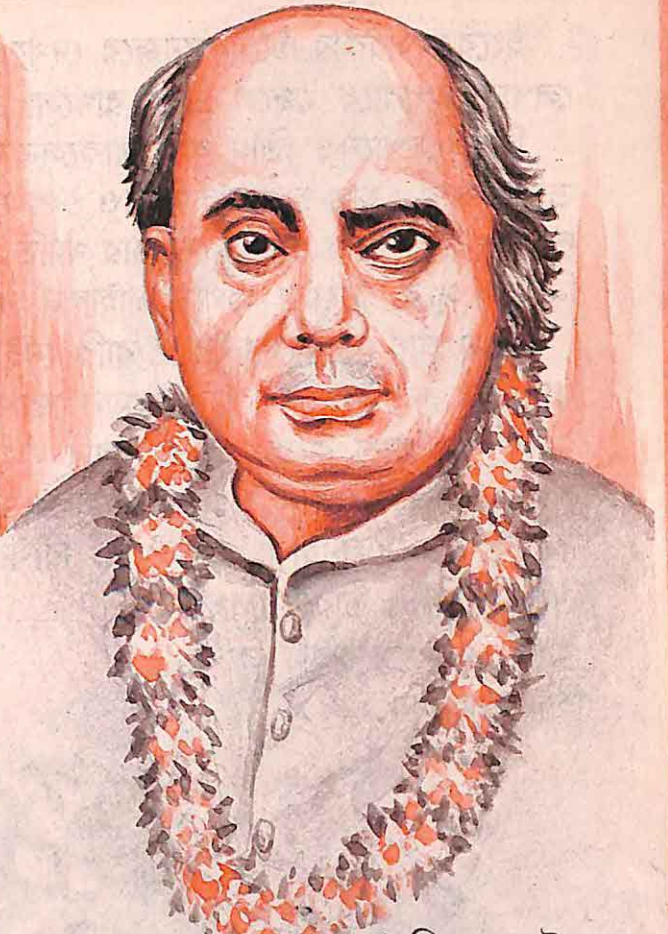
ইংরেজ সরকার তাঁকে সুনজরে দেখতো না। তাঁকে তারা গরম গরম কবিতা লেখার অপরাধে জেলে ভরে রাখলো।

কিন্তু সেখানেও তিনি বসে থাকলেন না। বন্দী অবস্থাতেই লিখলেন শিকল ভাঙার গান। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও দেশ-সেবার প্রেরণা দিতে তিনি লিখলেন ছাত্র দলের গান। সারা দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহী কবি হিসাবে। নিজের সুরে, নিজের কথায় গাইলেন বহু গান।

এখন আর তোমাদের বুঝতে বাকি নেই যে, ইনিই আমাদের সকলের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ইনি বর্ধমান জেলায় চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহ্মদ। মায়ের নাম জাবেদা খাতুন। ইনি ১৩৮৩ সালে বাঙলাদেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা,' 'সর্বহারা', 'বিষের বাঁশি' প্রভৃতি বহু কবিতার বই তিনি লিখে গেছেন। তাঁরই লেখা,

মোরা একবৃন্তে দুইটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান।

কিছু প্রশ্ন :

১) বিদ্রোহী কবি কাকে বলা হয়?
২) তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার বইয়ের নাম লেখ।
৩) তিনি কবে, কোথায় জন্মেছিলেন?
৪) তাঁর বাবা এবং মা-র নাম কি?

সেদিনের যুবক নেতাটি

তখন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় কলেরা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বস্তীর মানুষেরা অনেকেই মারা যাচ্ছিল সেই রোগে। কলকাতার এক যুবক বার হয়ে এলেন বাড়ী থেকে। আর সব সঙ্গী যুবকদের দিয়ে. গড়ে তুললেন সেবাদল।

তারপর সেবাদলের যুবকদের পাঠিয়ে দিলেন বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় পাড়ায়। নিজেও থাকলেন দলের সঙ্গে। তারপর দিন রাত সেবা করতে লাগলেন কলেরার কবলে পড়া গরীব মানুষদের। যোগান দিতে লাগলেন ওষুধ আর পথ্যের। অদ্ভুত যুবকটির নেতা হওয়ার ক্ষমতা। সকলেই তাঁর কথা মত কাজ করে চলে।

তা দেখে এক পাড়ার এক মেকী নেতা মহা বিপদে পড়লো। সেবক যুবকটির কথা সবাই মানে। তাকে আর কেউ পরোয়া করে না। সে ঠিক করলো, যেমন করেই হোক গুণ্ডা লাগিয়ে যুবক নেতাটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

এর কদিন পরেই ওই মেকী নেতাটির ছেলে মেয়েরাও কলেরায় আক্রান্ত হলো। মেকী নেতাটি কি করবে, ভেবে পায় না। একদিন সে তখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। এসে দেখে, যুবক নেতাটি তার ছেলে মেয়েদের ওষুধ খাওয়ানোয় এবং সেবায় ব্যস্ত। সে অবাক। যে নেতাটি সম্বন্ধে সে বিরূপ ছিল, সেই কিনা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত! সে তার ভুল বুঝতে পারে। ক্ষমা চেয়ে নেয় যুবক নেতাটির কাছে। মেকী নেতাটি যুবক নেতাটিকে সত্যিকারের নেতা বলে মেনে নেয়।

হ্যাঁ, এই যুবক নেতাই পরে আমাদের কাছে পরিচিত হলেন নেতাজী নামে। যাঁর পুরো নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

এঁর বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের একজন নামকরা সরকারী উকিল। তিনিও ছিলেন দেশের সেবক। মা প্রভাবতী দেবীও ছিলেন গরীবদের মায়ের মত। বাবা এবং মায়ের চরিত্রের গুণ লাভ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী কটকে তাঁর জন্ম হয়।

তখনকার দিনে আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সরকারী সর্বোচ্চপদে চাকরি মিলতো। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আই· সি, এস্ পাশ করেও সে চাকরি নেন নি। রাজ সম্মান ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশকে স্বাধীন করার কাজে।

তাঁকে ইংরেজ সরকার ভাল চোখে দেখতো না। তারা তাঁকে বারবার কারাবাস করিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু তবু তিনি নিজের পথ থেকে বিচলিত হন নি। ইংরেজ সরকার তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছিল পুলিস প্রহরায়। কিন্তু তিনি তাদের চোখে ধূলো দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান কাবুল হয়ে রোম থেকে জার্মানী। বিদেশেই গড়ে তোলেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। যার নাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। যে বাহিনীর সাহায্যে তিনি যুদ্ধ চালিয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে।

তাঁর 'দিল্লী চলো' ধ্বনি সেদিন হাজার হাজার যুবক-যুবতীকে সাহস জুগিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। তাঁর বাহিনীর 'কদম্ কদম্ বড়ায়ে যা' গান তাঁকেই মনে করিয়ে দেয়। জানি না, তিনি জীবিত কি মৃত। সে যাই হোক, তিনি চির অমর। 'নেতাজী অমর রহে'

কিছু প্রশ্ন :

১) কলকাতায় কলেরা দেখা দিতে যুবক নেতাটি কি করলেন ?
২) কে এই যুবক নেতা ?
৩) কোন সালের কোন্ তারিখটি তাঁর জন্ম দিন ?
৪) তাঁর গড়া বাহিনীটির নাম লেখ।

সাহসিনী মহিলা

মেয়েটির বাবা গরীব। মেয়েকে লেখা পড়া শেখাতে পারেন নি। কোন রকমে টাকা-পয়সা যোগাড় করে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তাও তার কপালে সুখ সইলো না। মেয়েটি বিধবা হলো।

তখন এদেশে চলেছে ইংরেজদের কঠোর শাসন। দেশের পক্ষে, দেশবাসীর হয়ে কোন কথা বলাই ইংরেজের কাছে বে-আইনী। 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলেই ইংরেজ পুলিস তাকে জেলে ভরছে। ইংরেজের বন্দুক-রিভলভারের মুখে প্রাণ দিচ্ছে কত মানুষ।

এসব দেখে-শুনে মেয়েটির প্রাণ কেঁদে উঠলো দেশবাসীর জন্যে। হলোই বা সে বিধবা, হলোই বা সে মেয়েছেলে, তার কি দেশের জন্যে কিছু করার নেই! ভাবতে থাকে মেয়েটি। মনের কাছ থেকে সাড়া পায়।

গ্রামের যারা রোগী, তাদের সে সেবা করে। ঘরে বসে চরকা কাটে। কারণ গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন বিলিতি কাপড়-জামা না পরতে। আর সময় পেলেই মেয়েটি ঘোরে বাড়ি বাড়ি। মেয়েদের জাগিয়ে তোলে দেশের কাজে লাগার জন্যে।

অবশেষে এলো ১৯৪২ সাল। যাকে স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে বলে 'বিয়াল্লিশের আন্দোলন'। সারা ভারত জুড়ে একটি মাত্র চিৎকার, 'অত্যাচারী ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।' আর ইংরেজ পুলিস দেশভক্তদের ধরে ধরে জেলে ভরতে লাগলো। কত মানুষ মারা গেলো ইংরাজের অত্যাচারের ফলে।

বিধবা মেয়েটি তখন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা। তিনিও বেরিয়ে পড়েছেন মেদিনীপুরের তমলুকের পথে। সঙ্গে তাঁর বিরাট মিছিল। এই মিছিলে মেয়েরাও

এগিয়ে এসেছে ওই বৃদ্ধার ডাকে। হাতে জাতীয় পতাকা আর মুখে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সামনে পুলিসের বাধা।

'খবরদার বুড়ীমা, আর এক পা এগিয়ো না'—পুলিস বাহিনী চিৎকার করে বলে।

বৃদ্ধা পুলিসের সে নিষেধ শুনলেন না। তিনি তাঁর পিছনের সকলকে শুনিয়ে বললেন, 'আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আমরা পুলিস বাহিনী ভেদ করে এগিয়ে যাবো।'

পুলিসের চিৎকার, 'আর এক পা এগোবে তো গুলি করবো।' বৃদ্ধা এগিয়ে গেলেন নির্ভয়ে। আর ওদিক থেকে ইংরেজ পুলিসের রাইফেল গর্জন করে উঠলো। প্রথমে গুলি এসে বৃদ্ধার কনুইয়ে লাগলো। বৃদ্ধা সে আঘাত গ্রাহ্য করলেন না। অপর হাতে জাতীয় পতাকা বাগিয়ে ধরে বন্দেমাতরম্ বলতে বলতে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। এমন সময় আর একটা গুলি এসে লাগলো তাঁর বুকে। এবার তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর দেহের রক্তে মাটি ভিজে গেল। তবু তিনি জাতীয় পতাকাটির অসম্মান করেন নি। সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি সেটিকে তখনও তুলে ধরেছিলেন। তারপর এক সময় তাঁর মৃত্যু হলো।

চিনতে পারছো এই সাহসিনী মহিলাটি কে? ইনিই স্বাধীনতার পূজারিনী মাতঙ্গিনী হাজরা। এঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস মাইতি। অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর অসাধারণ মেয়েটির জন্যে তিনিও সবার নমস্য। ইনি মেদিনীপুর জেলার হোগলা গ্রামে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।
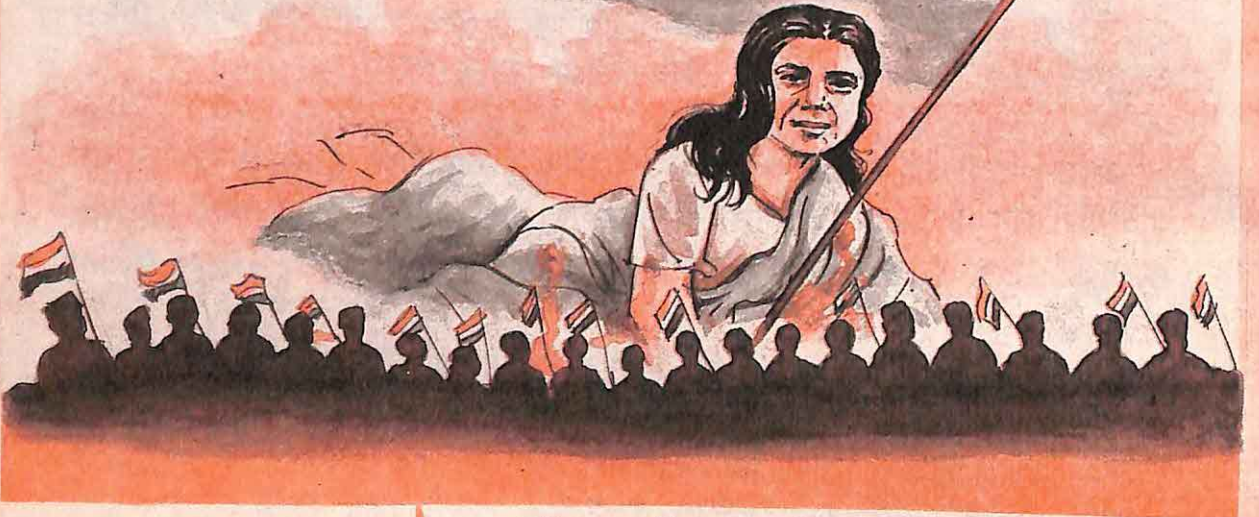
কিছু প্রশ্ন :

১) বিধবা মেয়েটির আসল পরিচয় কি?
২) তিনি কোন্ জেলার কোন্ গ্রামে জন্মেছিলেন?
৩) তিনি তাঁর হাতে কি ধরেছিলেন?

জেদী ছেলেটি

না, বইপড়ার শব্দ নয়। সারা ক্লাসে শব্দ হচ্ছে, দুম্-দুম্-দুম্। একজন ছাত্র টেবিলে ঘুঁষি মেরে চলেছে শিক্ষকমশায়ের সামনেই। একটা নয়, দুটো নয়, একটানা। তাহলে ঘটনাটা খুলেই বলি শোনো।

মাস্টারমশাই ক্লাসে এলেন। ছেলেদের বললেন, 'না, আজ তোমাদের পড়া ধরবো না।'

তা শুনে ছেলেরা খুব খুশী। বললো, 'গল্প বলুন স্যার, মজার মজার। আমরা মন দিয়ে শুনবো।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'না, গল্প নয়। একটা পরীক্ষা নেবো।' তা শুনে ছেলেদের সব আনন্দ উবে যায়। মাস্টারমশাই বললেন, 'শোনো, এ পরীক্ষার সঙ্গে বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই। পরীক্ষা নেবো গায়ের জোরের।' ছেলেরা আরও অবাক। তাহলে কি ক্লাসের মধ্যে মারামারি করতে হবে!

'শোনো, তোমরা একে একে আমার সামনে রাখা এই কাঠের টেবিলটার ওপরে ঘুঁষি মারো তো। সব থেকে বেশীবার ঘুঁষি মেরে কে প্রথম হয় দেখি।'

মাস্টারমশায়ের কথা শুনে ছেলেরা ভাবলো এ আর বেশী কথা কি! কিন্তু দেখা গেল, মাত্র কয়েকটা ঘুঁষি মারার পর সবাই থেমে যায়। আর পারে না।

ক্লাসে শেষের দিকে বসেছিল একটি ছেলে। তার দু'চোখে যেন ছাই-চাপা আগুন। কেমন যেন এক চিন্তায় ডুবে থাকে সে। এবার সেই ছেলেটি এগিয়ে আসে। ঘুঁষি চালায় টেবিলের উপর। এক মনে চালিয়ে যায় ঘুঁষির পর ঘুঁষি। অবশেষে ঘুঁষির আঘাতে তার হাতের তালু ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তবু সে থামে না।

মাস্টারমশাই অবাক। বললেন, 'আরে, থামো থামো, হয়েছে...সাবাস !'

ছেলেটি থামতে মাস্টারমশাই বললেন, 'পারবে বড় হয়ে তোমার এই ঘুঁষির আর মনের জোরকে কাজে লাগাতে ?'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, নিশ্চই পারবো স্যার।'

সত্যিই তিনি পেরেছিলেন। হ্যাঁ, ইনিই বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। যিনি জন্মেছিলেন ১৮৮৯ খৃষ্ঠাব্দে মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার বহুবনী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ত্রৈলোক্যনাথ আর মা'র নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

তখন ভারত পরাধীন। রাজত্ব করছে বিদেশী ইংরেজ। তাদেরই একজন বিচারক, নাম কিংস ফোর্ড। সেদিন যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছিলেন, তাঁদের সবারই এই কিংস ফোর্ডের বিচারে কঠোর শাস্তি পেতে হতো। তাই বিপ্লবীরা ঠিক করলেন, যেমন করেই হোক, এই কিংস ফোর্ডকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

সেই কঠিন কাজের ভার পড়লো ক্ষুদিরাম আর তাঁর বন্ধু প্রফুল্ল চাকীর উপর। মজঃফরপুরের পথে ওঁরা দুজনেই বোমা ছুঁড়েছিলেন কিংস ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে। কিন্তু সে গাড়িতে কিংস ফোর্ড ছিল না। মারা পড়লো অন্যজন।

পুলিসী সন্ধানে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হলো। তিনি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন। দেশের জন্য হাসতে হাসতে বিসর্জন দিলেন নিজের প্রাণ। দিনটি ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট।
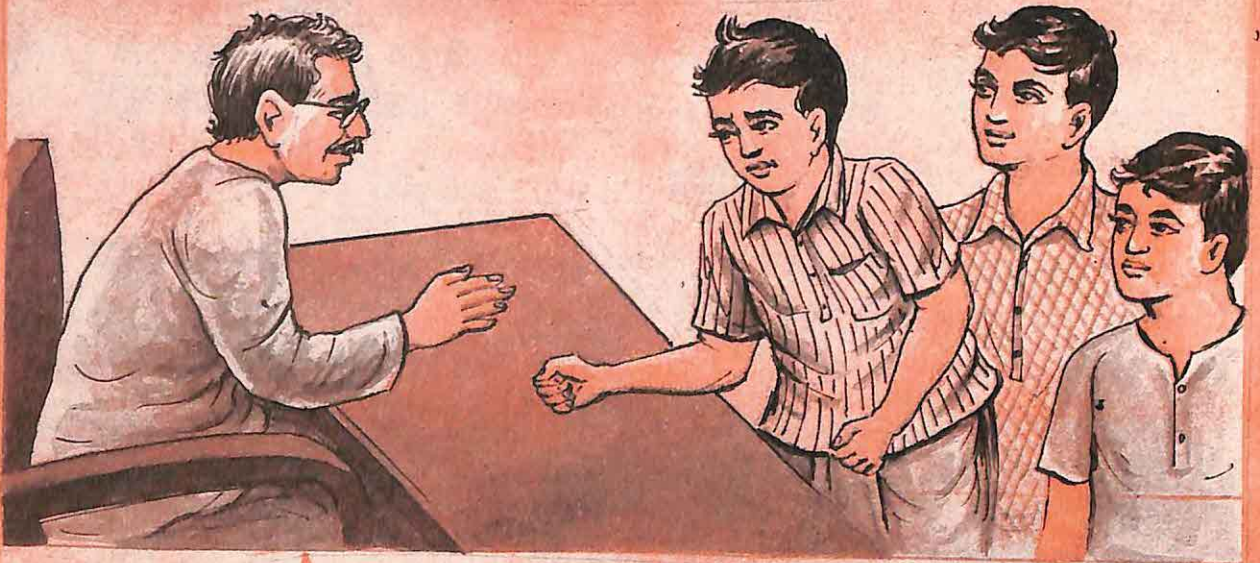
কিছু প্রশ্ন :

১) 'আজ তোমাদের পড়া ধরবো না', কথাগুলি কে, কাদের বলেছিলেন ?
২) পড়াধরার বদলে মাস্টারমশাই কি করলেন ?
৩) জেদী ছেলেটি কে ?

আচার্যের জীবন

ছেলেটি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বড় রুগ্‌নো সে। প্রায়ই ভোগে। কিন্তু সেবারে সে বড় অসুস্থ হয়ে পড়লো। স্কুল যাওয়া বন্ধ হলো। দু'একদিনের জন্যে নয়। পুরো দু'বছর সে স্কুল-মুখো হতে পারলো না।

অন্য ছেলে হলে খুশীই হতো। কেমন দু'বছর স্কুল যেতে হবে না। বই পড়তে হবে না। পড়া দিতে হবে না। পড়া না হলে শিক্ষকদের ধমক খেতে হবে না। অসুস্থ ছেলেটি কিন্তু তা করলো না। সে তার বাবার লাইব্রেরী থেকে তার পড়ার মত অজস্র বই পেলো। সে সেসব বই পড়ে ফেললো। যে বই একবার পড়ে বুঝতে পারতো না, সে বই সে আবার পড়তো। না বুঝলে কিছুতে সে বইকে রেহাই দিতো না। এই ছেলেই পরে বড় হলেন। শুধু বয়সে নয়, গুণে এবং কাজে। সহজ সরল জীবন যাপন করে কত বড় চিন্তা, কত কঠিন চিন্তা যে করা যায়, তা তিনি তাঁর কাজ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। ইনিই প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় যাঁকে আচার্য বলে পূজো করেন সবাই।

রাত দিন গবেষণা করে তিনি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রেখে গেছেন। যে সমস্ত বাঙালী বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে বড় হয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের ইচ্ছা হলো, তিনি বিলাত যাবেন আরও পড়াশোনার জন্যে। কিন্তু টাকা কোথায় ? তাঁর বাবা মহা চিন্তায় পড়লেন। তাঁর ছাপা একটি অভিধান বই ছিল। লেখাপড়া জানা যুবক প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় একটি ছোট দোকান খুলে সেখান থেকে অভিধানখানি বিক্রী করতে লাগলেন। বিক্রী হলো সব বই। কিন্তু তাতে তো বিলাত যাওয়া যায় না। এই সময় ভাগ্যক্রমে তিনি একটি বৃত্তি পান।
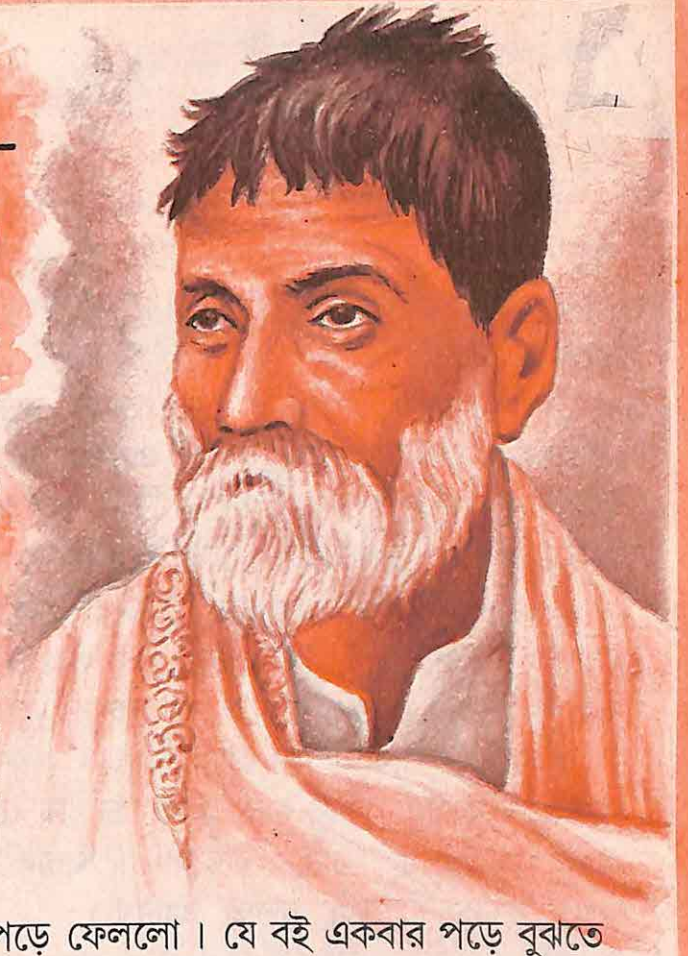
সেই বৃত্তির টাকায় তিনি বিলাত যান এবং সেখানে তিনি ডি-এস্‌সি পরীক্ষা পাশ করে আসেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত চলেছেন জাহাজে চড়ে। জাহাজ পৌঁছাতে সময় লাগবে অনেক। তিনি সঙ্গে নিলেন একগাদা বই আর কাগজ। জাহাজে বিলাত যাওয়ার পথেই তিনি কয়েকখানি বই লিখে ফেললেন। অযথা সময় তিনি কোন সময়ই নষ্ট করতেন না।

বেংগল কেমিক্যাল্‌-এর নাম তোমরা বড় হয়ে শুনবে। এটি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের হাতে তৈরী। মাত্র আটশ টাকা নিয়ে এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তিনি আরম্ভ করেন। তাঁর সততা এবং নিষ্ঠার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের জিনিস বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

লেখাপড়া শিখে বাঙালীর ছেলেরা একটা চাকরি পাবার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায়। আচার্য এই অভ্যাসটিকে ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন, বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা শিখুক। তারা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে শিখুক।

খুলনা জেলার রাঢুলি গ্রামে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হরিশচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলে মানুষের মত মানুষ হোক। তা তিনি হয়েছিলেন। আচার্য ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি সত্যই আচার্য।

কিছু প্রশ্ন :

১) রুগ্‌নো ছেলেটির আসল পরিচয় কি?
২) তাঁর বাবার নাম কি?
৩) তিনি কবে কোথায় জন্মেছিলেন?
৪) তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।

দুষ্টু দরদী

পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা। অনেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়ে দু'টি ছেলে। দু'জনেই বড় দুষ্টু। তাদের একজন আবার সেরা দুষ্টু। দুষ্টুমীতে পাড়ার সবাই অস্থির।

এই দুটি ছেলের সঙ্গে ঘোরে ফেরে একটি মেয়ে। সে ওদের সাথী। সারা গাঁয়ের বাগানের সংবাদ ওই মেয়েটির কাছে। কার বাগানের কোন্ গাছে আম-জাম-পেয়ারা পেকেছে,সে সব খবর মেয়েটি রাখে। আর সেই সব দরকারী খবর পৌঁছে দেয় ওই দুই দুষ্টু ছেলের কাছে।

সেদিন পিয়ারী পণ্ডিত পড়াতে পড়াতে কোন্ ফাঁকে ঘুমিয়ে গেছেন। ছেলে দুটি দেখলো, এই সুযোগ। ব্যস, সেই সুযোগে ওরা দু'জনে হাওয়া। মেয়েটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তারপর বাগানের আম-জাম-পেয়ারা খেয়ে আবার ফিরলো পাঠশালায়। হাসি মুখে মেনে নিলো পণ্ডিতমশায়ের চাবুক।

কিন্তু কেমন করে এই দুষ্টুমীই তাদের একজনকে মানুষের প্রতি দরদী করে তুললো, সে কথা শোনাই শোনো।

দলের সেরা দুষ্টু ছেলেটি একদিন ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছে। দৌড় দিচ্ছে ফড়িংয়ের পিছু পিছু। এক সময় ধরেও ফেলে একটা ফড়িং। কিন্তু কেমন করে যেন ফড়িংটার একটা ডানা ছিঁড়ে গেল। ফড়িংটাকে মাটিতে নামিয়ে দেয় ছেলেটি। সে উড়তে পারে না। নেতিয়ে পড়ে থাকে।

তা দেখে ছেলেটির বড় মায়া হলো। সে নিজেকে দায়ী করলো। কারণ তার জন্যেই ফড়িংটার এই দুর্দশা। তার যদি এমনি করে কেউ হাত কিংবা পা ভেঙে দিতো! তারও তো কত যন্ত্রণা হতো তাহলে!
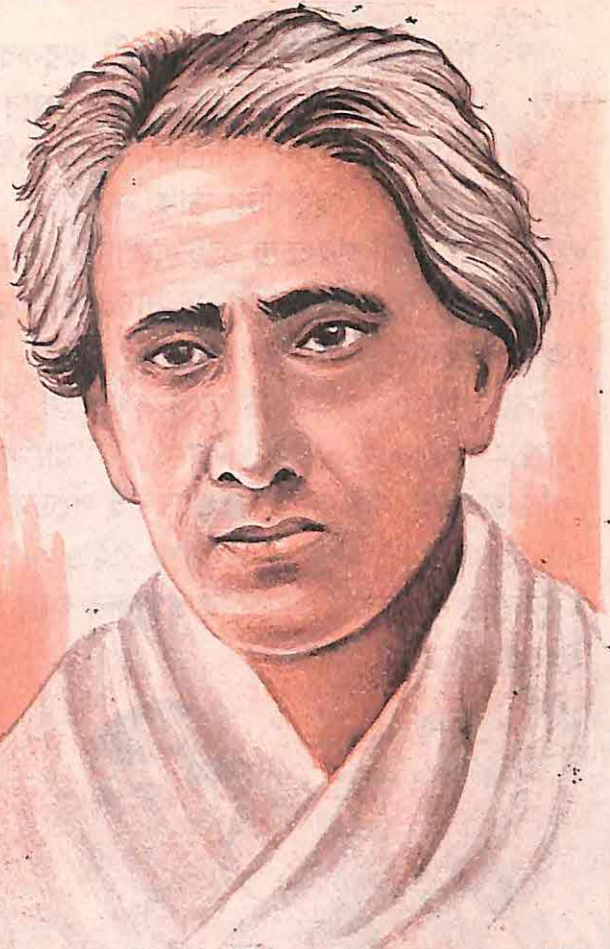
এই সব ভাবতে ভাবতে ছেলেটি ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলে। মনে মনে শপথ নেয়, নিরীহ এইসব জীবদের নিয়ে আর কখনো খেলা করবে না।

ফড়িংটার জন্যে এই সমবেদনাই ছেলেটিকে তার পরবর্তী জীবনে মানব দরদী করে তুলেছিল। ছেলেটির ডাক নাম ছিল ন্যাড়া। এই ন্যাড়াই আমাদের বরণীয় দরদী কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁর বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৭৬ সালে ইনি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কথা ইনি দরদ দিয়ে লিখে গেছেন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। 'রামের সুমতি', পল্লীসমাজ', 'মেজদি', 'পণ্ডিতমশাই', 'দেবদাস' প্রভৃতি বই পড়েন নি, এমন বাঙালী পাঠক নাই। তোমরা বড় হয়ে পড়ে নিও এঁর লেখা বইগুলি। দেখো, সমাজের নির্যাতীত-নিপীড়িত মানুষদের কথা কত আগে, কত সুন্দর করে ইনি লিখে গেছেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কিছু প্রশ্ন :

১) দুষ্টু ছেলে দুটি কোন্ পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তো ?
২) তাদের নানা বাগানের খবর কে এনে দিত ?
৩) ফড়িং ধরা ছেলেটি আসলে কে ?
৪) তাঁর দু'চারখানি বইয়ের নাম লেখ।

সত্যবাদী যুবক
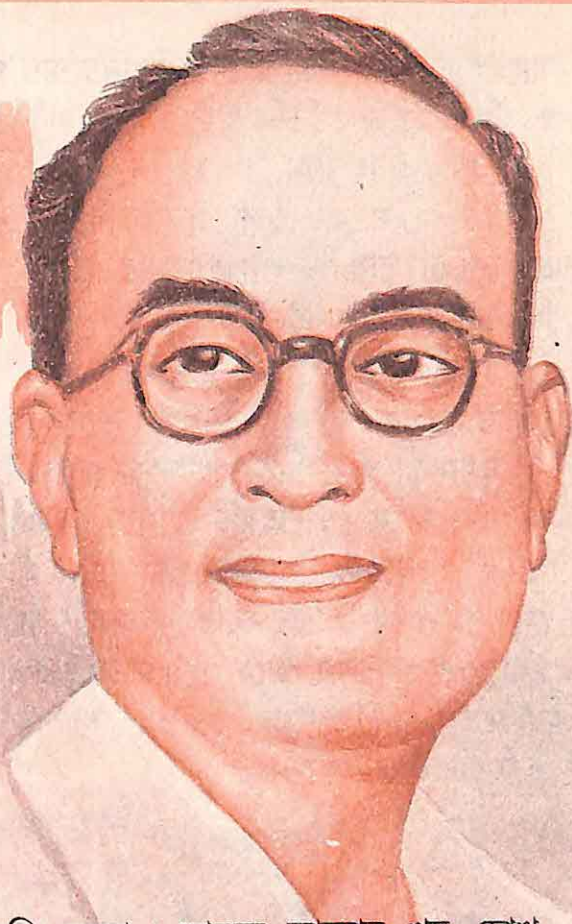
কলকাতার রাজপথ। অগুণতি গাড়ী চলেছে। চলেছে একখানা ট্রাম গাড়িও। ট্রামের ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং ক'রে। কারণ সে গাড়ির সামনে একখানা মোটর। মোটরে বসে আছেন একজন লালমুখো সাহেব ডাক্তার।

সাহেব ডাক্তারের গাড়ি ঢুকবে মেডিক্যাল কলেজের ভিতর। সাহেব ডাক্তার ট্রাম গাড়ির ঢং-ঢং ঘণ্টার নিষেধ অগ্রাহ্য করলেন। চলন্ত ট্রামের সামনে দিয়ে তিনি তাঁর মোটর গাড়ি আনবেনই। ব্যস, ঘটলো বিপদ। চলন্ত ট্রামের সঙ্গে মোটরটির লাগলো ধাক্কা। মেটরটির ক্ষতি হলো। সাহেব ডাক্তার খুব চোখ রাঙালেন ট্রামের চালকের দিকে তাকিয়ে। সেই সময় মেডিক্যাল কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন মেডিক্যালের ছাত্র। সাহেব ডাক্তার তাঁকে বললেন, 'তুমি তো এখানে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপারটাই দেখলে ? আমি ট্রামের চালকের বিপক্ষে কোম্পানীর কাছে নালিশ করবো। তেমার সাক্ষ্য দিতে হবে।'

যুবক ছাত্রটি বললেন, 'নিশ্চয়ই দেবো। তবে যা নিজের চোখে দেখেছি, তা-ই বলবো কিন্তু। কারণ দোষ আপনার।'

'তার মানে ? তুমি তাহলে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে না ?'

'না স্যার, মিথ্যা বলতে পারবো না।'

কিছুদিন পরে মেডিক্যালের পরীক্ষায় ওই সাহেব ডাক্তারের কাছে যুবক ছাত্রটিকে পরীক্ষা দিতে হবে। তিনি জানেন, এই রাগে সাহেব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষার ফেল্ করিয়ে দেবেনই। তবু ভয় না পেয়ে যুবক ছাত্রটি সত্যকেই আঁকড়ে থাকলেন। মিথ্যার দিকে গেলেন না। হ্যাঁ, এই নির্ভীক সত্যবাদী যুবকই পশ্চিমবাংলার রূপকার এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

সাহেব ডাক্তার সত্য সত্যই বিধানচন্দ্রের পরীক্ষা নেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি পরে এম্,ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত থেকে এফ্, আর, সি, এস্ এবং এম্, আর, সি, পি পরীক্ষা পাশ্ করে দেশে ফেরেন।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্র পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। মা অঘোরকামিনী দেবীও ছিলেন একজন দানশীলা মহিলা।

১৯৩০ সালে যখন এদেশ পরাধীন, তখন তিনিই প্রথম কোন রকম ভয় না পেয়ে কলকাতা করপোরেশন-ভবনের শীর্ষে জাতীয় পতাকা তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি পশ্চিমবাংলার উন্নতির কথা সব সময় ভাবতেন। আজ কল্যাণী নামে যে শহরটি আমরা দেখছি, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের যে দুধ আমরা পাচ্ছি—এসবই বিধান রায়ের সৃষ্টি। ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরও তাঁর কীর্তির কথাই ঘোষণা করে। তাঁর মত জনদরদী চিকিৎসক শুধু ভারতে নয়, সারা এশিয়া মহাদেশে খুব কম মেলে। একবার চোখে দেখেই তিনি রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই কর্মবীর ডাঃ বিধানচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

কিছু প্রশ্ন :

১) মোটরের সঙ্গে ট্রামের ধাক্কা লাগার জন্যে দায়ী কে?
২) সত্যবাদী যুবকটি কে?
৩) তিনি পশ্চিমবাংলার জন্যে কি কি কাজ করেছিলেন?

জাদুর রাজাধিরাজ

জীবন্ত মানুটাকে মঞ্চের উপরে একটা টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হলো। সামনে অগুণতি দর্শক। একটু পরেই ধারালো একটা করাত নেমে আসবে। আর চোখের সামনে জীবন্ত মানুষটার দেহটা দু'টুকরো হয়ে যাবে।

জাদুকর এসে নানা কথা বলতে থাকেন। 'আপনারা যে যার আসনে শান্ত হয়ে বসুন। এ খেলা জীবন-মরণের খেলা। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে কেমন করে একটা মানুষকে দু'খানা করে ফেলি।'

জাদুকরের জাদু-মাখা কথায় সবার সামান্য ফিস্‌ফিসানিও থেমে যায়। সবাই চুপচাপ। হলঘরের মেঝের উপরে একটা আলপিন পড়লে সে-শব্দও বুঝি শোনা যাবে। সারা ঘরে একটা ভয়-ছম্‌ছম্‌ ভাব। অবশেষে শুরু হলো মানুষ-কাটার খেলা। জাদুকর চালিয়ে দিলেন করাত। সাপের মত হিস্‌হিস্‌ শব্দ করতে করতে করাত নেমে এলো টেবিলে শুইয়ে দেওয়া মানুষটার পেটের উপরে। চোখের নিমেষে গোটা মানুষটা দু'টুকরো হয়ে যায়। রক্ত ভেসে যায় টেবিলের উপর দিয়ে।

মনে মনে হায় হায় করে ওঠেন দর্শকের দল। চোখ দিয়ে যেন দেখা যায় না ওই দৃশ্য ! সর্বনাশ হয়ে গেল মানুষটার দু'টুকরো মানুষটা কি আর জোড়া লাগবে ! যাঁরা দুর্বল, তাঁরা জাদুকরের ওই-জীবন-মরণের খেলা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশেষে দেখা যায়, জাদুকর তাঁর জাদু-কাঠির ছোয়ায় গোটা করে দেন কাটা মানুষটাকে। এক মুখ হেসে জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দর্শকদের অভিবাদন জানান। দর্শকরা ধন্য ধন্য করে ওঠেন।

সাহেব ডাক্তার সত্য সত্যই বিধানচন্দ্রের পরীক্ষা নেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি পরে এম্,ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত থেকে এফ্, আর, সি, এস্ এবং এম্, আর, সি, পি পরীক্ষা পাশ্ করে দেশে ফেরেন।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্র পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। মা অঘোরকামিনী দেবীও ছিলেন একজন দানশীলা মহিলা।

১৯৩০ সালে যখন এদেশ পরাধীন, তখন তিনিই প্রথম কোন রকম ভয় না পেয়ে কলকাতা করপোরেশন-ভবনের শীর্ষে জাতীয় পতাকা তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি পশ্চিমবাংলার উন্নতির কথা সব সময় ভাবতেন। আজ কল্যাণী নামে যে শহরটি আমরা দেখছি, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের যে দুধ আমরা পাচ্ছি—এসবই বিধান রায়ের সৃষ্টি। ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরও তাঁর কীর্তির কথাই ঘোষণা করে। তাঁর মত জনদরদী চিকিৎসক শুধু ভারতে নয়, সারা এশিয়া মহাদেশে খুব কম মেলে। একবার চোখে দেখেই তিনি রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই কর্মবীর ডাঃ বিধানচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

কিছু প্রশ্ন :

১) মোটরের সঙ্গে ট্রামের ধাক্কা লাগার জন্যে দায়ী কে?
২) সত্যবাদী যুবকটি কে?
৩) তিনি পশ্চিমবাংলার জন্যে কি কি কাজ করেছিলেন?

জাদুর রাজাধিরাজ

জীবন্ত মানুটাকে মঞ্চের উপরে একটা টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হলো। সামনে অগুণতি দর্শক। একটু পরেই ধারালো একটা করাত নেমে আসবে। আর চোখের সামনে জীবন্ত মানুষটার দেহটা দু'টুকরো হয়ে যাবে।

জাদুকর এসে নানা কথা বলতে থাকেন। 'আপনারা যে যার আসনে শান্ত হয়ে বসুন। এ খেলা জীবন-মরণের খেলা। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে কেমন করে একটা মানুষকে দু'খানা করে ফেলি।'

জাদুকরের জাদু-মাখা কথায় সবার সামান্য ফিস্‌ফিসানিও থেমে যায়। সবাই চুপচাপ। হলঘরের মেঝের উপরে একটা আলপিন পড়লে সে-শব্দও বুঝি শোনা যাবে। সারা ঘরে একটা ভয়-ছম্‌ছম্‌ ভাব। অবশেষে শুরু হলো মানুষ-কাটার খেলা। জাদুকর চালিয়ে দিলেন করাত। সাপের মত হিস্‌হিস্‌ শব্দ করতে করতে করাত নেমে এলো টেবিলে শুইয়ে দেওয়া মানুষটার পেটের উপরে। চোখের নিমেষে গোটা মানুষটা দু'টুকরো হয়ে যায়। রক্ত ভেসে যায় টেবিলের উপর দিয়ে।

মনে মনে হায় হায় করে ওঠেন দর্শকের দল। চোখ দিয়ে যেন দেখা যায় না ওই দৃশ্য! সর্বনাশ হয়ে গেল মানুষটার দু'টুকরো মানুষটা কি আর জোড়া লাগবে! যাঁরা দুর্বল, তাঁরা জাদুকরের ওই-জীবন-মরণের খেলা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশেষে দেখা যায়, জাদুকর তাঁর জাদু-কাঠির ছোঁয়ায় গোটা করে দেন কাটা মানুষটাকে। এক মুখ হেসে জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দর্শকদের অভিবাদন জানান। দর্শকরা ধন্য ধন্য করে ওঠেন।

বলো, কে এই জাদুকর ? ইনিই বিশ্বজয়ী জাদুর রাজা পি, সি, সরকার । বাঙলা, তথা ভারতের ইনি গৌরব ।

জাদুর রাজা পি, সি, সরকার ১৯১৩ সালে বর্তমান বাঙলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন । পি, সি, সরকারের পুরো নাম প্রতুলচন্দ্র সরকার । তাঁর বাবার নাম ছিল ভগবানচন্দ্র সরকার ।

জাদুকর পি· সি· সরকার শুধু নিজের দেশে নয়, চীন-জাপান-রাশিয়া-আমেরিকা-ইউরোপ, এক কথায় পৃথিবীর প্রতি বড় বড় দেশে তিনি তাঁর জাদুর খেলা দেখিয়েছেন । দুনিয়ার দরবারে তিনি এদেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জাদুকর পি· সি· সরকারের যোগাযোগ ছিল । নেতাজী একবার স্বাধীন সিঙ্গাপুরে কিছু জিনিস গোপনে পাঠাতে চাইছিলেন । পি· সি· সরকার সেবার চলেছেন সিঙ্গাপুরে—ম্যাজিক দেখাতে । নেতাজী তাঁর জিনিসগুলি তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এগুলো সিঙ্গাপুরে পৌঁছে দেওয়া চাই !

পুলিসের কাছে এ খবর কিভাবে ফাঁস হয়ে যায় । তারা এসে জাদুকরের বাক্স-প্যাঁটরা তল্লাসী চালালো নেতাজীর গোপনে পাঠানো জিনিসগুলির জন্যে । কিন্তু জাদুকর সরকার অদ্ভুতভাবে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলেন ইংরেজ পুলিসদের চোখে । নেতাজীর পাঠানো জিনিসগুলি তাঁর একটি বাক্সে থাকা সত্ত্বেও তারা দেখতে পায় নি । এও তাঁর এক ধরণের ম্যাজিক ।

কতবার তিনি চোখ বাঁধা অবস্থায় রাশিয়া-আমেরিকার রাজপথে মোটর সাইকেল চালিয়েছেন । জীবন্ত হাতী কিংবা যাত্রী সমেত মোটর গাড়ি মঞ্চে দর্শকের সামনে থেকে উধাও করে দিয়ে অবাক করে ছেড়েছেন দর্শকদের ।

এই জাদু সম্রাট ১৯৭১ সালের ৬ই জানুয়ারী জাপানের ম্যাজিক দেখানো শেষ করে অসুস্থ হলেন এবং আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের জন্যে ।

কিছু প্রশ্ন :

১) পি· সি· সরকারকে আমরা যাদুর রাজা বলি কেন ?
২) কোথায় তিনি খেলা দেখাতে গিয়ে মারা যান ?
৩) তাঁর পুরো নাম কি ?

ফুটবলের রাজা

আজকের বাংলা দেশের একটি গ্রাম । নাম ভাগ্যকুল । এই গ্রামে খেলতে গেছে কলকাতার নাম করা ফুটবল দল—মোহনবাগান । বিপক্ষ দলে খেলবেন ওই ভাগ্যকুল অঞ্চলের যাঁরা সেরা খেলোয়াড়, তাঁরা ।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে একটি ছেলে । ভাগ্যকুল তার মামার বাড়ি । সে তখন তার মামার বাড়িতেই । সেই বয়সেই ছেলেটি ফুটবল খেলে সুনাম পেয়েছে ছোট বড় সবার কাছ থেকে । কাজেই মোহনবাগানের বিপক্ষ খেলোয়াড়দের দলে সে খেলার সুযোগ পেল ।

এই সুযোগ তার কাছে স্বপ্নের মত । সে ভাবতেও পারে না, যে দলের খেলোয়াড়দের সে দেবতা বলে মনে করে, সেই দলের বিপক্ষে সে পেলো খেলার সুযোগ । তাই সে মন-প্রাণ দিয়ে সেদিনের মাঠে খেললো । ওই বয়সের একটি ছোট ছেলে যে অমন অপূর্ব খেলা খেলতে পারে, তা মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়রাও ভাবতে পারেন না । খেলার শেষে মোহনবাগান দলের একজন নামী খেলোয়াড় ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন । শুনলেন, সে কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে থাকে ।

তিনি বললেন, 'তুমি কলকাতা ফিরলে মোহনবাগানের তাঁবুতে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না ।'

ব্যস্ত ছেলেটির মোহনবাগান দলের হয়ে খেলোয়াড় জীবন শুরু হলো শুধু শুরু নয়, সারা জীবন তিনি খেলে গেছেন ওই দলের হয়ে । ইনিই ফুটবলের যাদুকর প্রাঃতস্মরণীয় খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল । যাঁকে বিপক্ষ দলের প্রতিটি
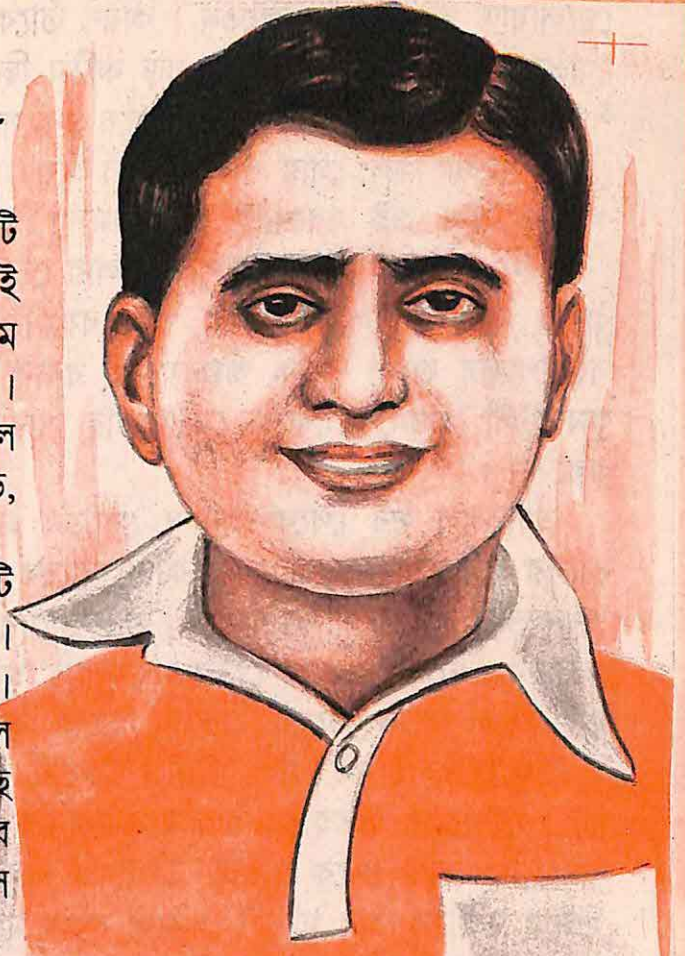
খেলোয়াড় ভয় পেয়ে চলতেন। কারণ তাঁকে কাটিয়ে বল নিয়ে মোহনবাগানের গোলরক্ষকের মুখোমুখী হওয়া বড় কঠিন ছিল। তাই তাঁকে বলা হতো 'চীনের পাঁচিল'। চীন দেশের পাঁচিল পার হয়ে এক সময় যেমন বিদেশী হানাদারদের চীনে ঢোকা সমস্যা ছিল, গোষ্ঠ পালকে পার হয়ে যাওয়া বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দেরও কাছেও ছিল ওই ধরণেরই এক সমস্যা।

তিনি ১৮৯৬ সালে ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শ্যামলাল পাল। অল্প বয়সেই গোষ্ঠপাল তাঁর বাবাকে হারান। পড়াশোনার জন্যে তাঁকে অল্পবয়সেই কলকাতা চলে আসতে হয়। কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে থেকে সেখানকার সারদাচরণ বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করতেন।

গোষ্ঠপাল সব থেকে আনন্দ পেতেন লালমুখো সাহেবদের বিপক্ষে খেলে তাদের হারিয়ে দিতে পারলে। কারণ সাহেবরা তখন রাজার জাত। কারণ তারাই তখন ভারতবর্ষকে শাসন করছে। তাই তাদের হারিয়ে গোষ্ঠপাল আনন্দ পেতেন। বলতেন, 'ওদের বিরুদ্ধে খেলতে খেলতে আমার মনে হয়, আমি যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।'

শুধু ফুটবলই নয়, হকি, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি নানা খেলাতেই তিনি ছিলেন পটু। ফুটবলের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে পদ্মশ্রী উপাধিও লাভ করেছিলেন। কলকাতার ময়দানে খেলার ভঙ্গীতে তাঁর মূর্তিটি দেখলে সবার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিছু প্রশ্ন :

১)। ভাগ্যকুলের মাঠের অল্প বয়সী খেলোয়াড়টি কে ?
২) তিনি কলকাতার কোন অঞ্চলে থাকতেন ?
৩) ভারত সরকার তাঁকে কি উপাধি দান করেছিলেন ?
৪) তাঁর জন্মস্থান কোথায় ?

A Classic Rapid for Junior Classes
বাংলার গৌরব
Published By
Jharna Datta
9A College Row. Calcutta-9
PRINTED BY PRINTWELL OFFSET 11, McLEOD STREET, CALCUTTA-17
Price- 7/-